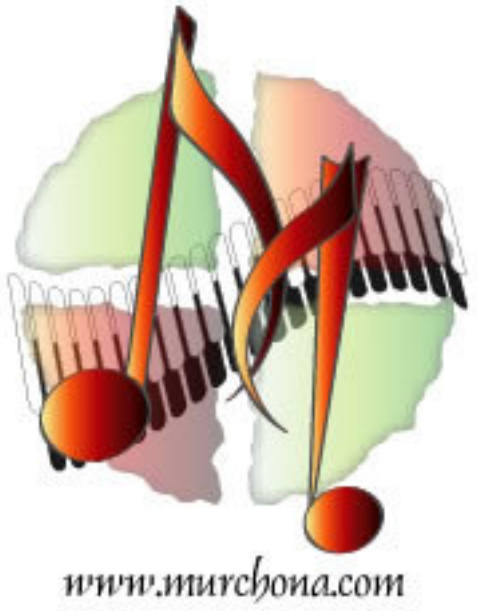

Megh Pahar by Suchitra Bhottacharya

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com

suman_ahm@yahoo.com

মেঘ পাহাড়

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

সবে আজ সকালে দিল্লি থেকে চন্ডীগড় এসেছি আমরা। দিল্লি আগ্রা ঘোরা শেষ, ইচ্ছে ছিল চন্ডীগড়ে আর একটা দিন জিরিয়ে নিয়ে রওনা দেব পাহাড়ের পথে। কুলু মানালি রোটাং। ফেরার পথে সিমলা হয়ে ব্যাক টু প্যাভিলিয়ান। কলকাতা।

তা মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। চাইলেই কি আর ছকে বেঁধে রাখা যায় সবকিছু? আচমকাই সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেল।

রাতে চাইনিজ খাবে বলে বিকেল থেকেই বায়না ধরেছিল রিয়া। শুভেন্দুরও ছেলেমানুষি কম নেই, সেও নেচে উঠল মেয়ের সঙ্গে। সেজেগুজে সাড়ে সাতটা নাগাদ হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। চন্ডীগড়ের মতো বড় শহরে চীনা রেস্তোরাঁ খুঁজে বার করা এমন কিছু দুরূহ কজ নয়, অটোওয়ালাকে বলা মাত্র সে আমাদের পৌঁছে দিল সেক্টর সেভেনটিনে।

বড় রাস্তার উপরেই প্রকাণ্ড রেস্তোরাঁ। বাইরে আলো ঝলমল সাইনবোর্ড। কাউ-লুন্।

মোটা কাচের দরজা ঠেলতেই ঝাপটে এসেছে হিমেল বাতাস। অচেনা আশংকার মতো। অন্দরে পা রেখে আমাদের চক্ষু স্থির। ওরে বাবা, কী এলাহি ব্যাপার!

ফিসফিস করে বলেই ফেললাম,– এ যে দেখছি রীতিমত বড়লোকির জায়গা!

শুভেন্দুও চমকিত হয়েছে যথেষ্ট। পকেটে রেস্ত থাকলেও এ ধরনের বিলাসবহুল ব্যবস্থায় শুভেন্দু সে রকম অভ্যস্ত নয়। হাজার হোক জাতে তো মাস্টার। তবে মাস্টার বলেই বুঝি অস্বস্তির ভাবটা গোপন রাখতে পারে বেশ।

গলা নামিয়ে বরল, – কী আর করা যাবে, চন্ডীগড় তো এ রকমই। দেখছ না, এ শহরে কেউ খুচরো পয়সা ফেরত দেয় না।

–এখানে খেতে হবে না। চলো, বেরিয়ে পড়ি।

–খেপেছ? ঢুকেই যখন পড়েছি, তখন আর নড়ছি না। একটা দিন নয় কটা পয়সা উড়লই।

কথার ফাঁকেই রেস্তোরাঁর স্টুয়ার্ড সামনে হাজির। মঙ্গোলিয়ান ছাদের মুখ, স্যুট বুট টাই-এ টিপটপ। বয়স আন্দাজ করা কঠিন। পঁচিশ হতে পারে, পঁয়তাল্লিশ হওয়াও বিচিত্র নয়। লম্বা একখানা বাও করল স্টুয়ার্ডটি,– গুড ইভনিং স্যার। গুড ইভনিং ম্যাডাম। ওয়েলকাম টু কাউ-লুন।

–গুড ইভনিং।

-রিজার্ভড এনি টেবল্ স্যার?

–নো। শুভেন্দু কায়দা করে কাঁধ ঝাঁকাল, – অ্যাকচুয়ালি জাস্ট নাউ উই হ্যাভ ডিসাইডেড টু হ্যাভ আওয়ার ডিনার...

–নো প্রবলেম স্যার। কাম দিস সাইড প্লিজ।

জায়গা মিলল রেস্তোরাঁর একেবারে শেষ প্রান্তে। ডানদিকের একটা টেবিলে। ছোট্ট টেবিল চারজনের। আমরা মা মেয়ে বসেছি পাশাপাশি, মুখোমুখি শুভেন্দু। ইয়া ইয়া গোবদা গোবদা দু'খানা বোর্ড বাঁধাই মেন্যু কার্ড দিয়ে গেছে স্টুয়ার্ড, তিনজনেই দেখছি মন দিয়ে।

মেন্যুকার্ডে চোখ বোলাতে বোলাতে শুভেন্দু জিজ্ঞেস করল,– কী রে, কী খাবি?

মহার্ঘ হোটেলে ঢুকে রিয়া বেশ খুশি খুশি। ঝকঝক করছে চোখ। তবে এ বছর মাধ্যমিক পাস করে তার মধ্যে একটা বড় বড় ভাব এসে গেছে, সহজে মুখে কোনও অভিব্যক্তি ফুটতে দেয় না। মেয়ে বোঝে না, এও এক ধরনের ছেলেমানুষি।

আহার নিয়ে আলাপচারিতা শুরু হয়ে গেছে বাপ মেয়ের।

কৃত্রিম গাম্ভীর্য বজায় রেখে রিয়া ঠোঁট টিপে বলল,– স্টার্টার নিই একটা?

–কী নিবি?

–ক্র্যাক্‌রিং স্পিনাচ?

–পালংশাক ভাজা খাবি? চিনা হোটেলে বসে?

–দ্যাখো না খেয়ে। দারুণ টেস্ট।

–নিয়ে নে তবে।

–সঙ্গে হাফ প্লেট থাই স্যুপও বলে দিই? তিনজনে ভাগ করে নেব?

–আর মেন কোর্স?

–আগে এই অর্ডারটা তো দেয়া হোক। তারপর....। কী মা, ঠিক আছে তো?

এতে আর আমার বলার কী আছে? চাইনিজ খাবার সবই আমার চলে। অল্প তেল, অল্প মসলা, খেতেও ভাল, হজমেরও কোনও সমস্যা নেই....। আলতো করে ঘাড় নাড়লাম। চোস্ত স্টুয়ার্ডকে ডেকে চোস্ত ইংরেজিতে অর্ডার দিয়ে দিল মেয়ে। দারুণ স্মার্ট হয়েছে কিন্তু, দেখতে বেশ লাগে। রিয়ার বয়সে কী কেবলুশটাই না

ছিলাম আমি। এমন কেতাদুরস্ত রেস্তোরাঁয় বসে এমন সপ্রতিভ ভঙ্গিতে খাবার অর্ডার দিচ্ছি....উহুঁ, ভাবতেই পারতাম না।

চিনে খাবার মানে অন্তহীন প্রতীক্ষা। বসে আছি তো বসেই আছি। এলোমেলো চোখ ঘুরছে চারদিকে। নাহ্, জায়গাটার বাহার আছে। কাঠের প্যানেরিং-এ কী চমৎকার কারুকাজ, কাচ বসানো সিলিং-এ আঁকা রয়েছে ছোট ছোট মোটিভ, দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর পেন্টিং। দেখে মনে হচ্ছে পেন্টিংগুলো অরিজিনাল। নাও হতে পারে অবশ্য। হয়তো প্রিন্ট। হয়তো কপি। আসল নকল তো বোঝা ভার। বিশাল কক্ষটায় বেশ কয়েকটা কাঠের থাম, বরফি বরফি কাচ বসানো। আলো পিছলোচ্ছে কাচে। স্তিমিত আলোয়, কনকনে শীতলতায়, দিব্যি তৈরি হয়েছে একটা ঘোর লাগা পরিবেশ।

হঠাৎই দৃষ্টি ধমকেছে আমার। ও কে বসে আছে দূরের ওই টেবিলটায়? ঠিক দেখছি তো? হ্যাঁ, সেই তো! অবিকল সেই চেহারা! লম্বা! বলিষ্ঠ! নির্মেদ! সেই ঝকঝকে উজ্জ্বল মুখ! সেই প্রশস্ত কপাল! ইস্পাতের তলোয়ারের মতো ধারাল নাক! সাগর গহন চোখ! মাথার চুলগুলো পর্যন্ত একইভাবে আঁচড়ানো! সামনেটা অল্প ফাঁপানো, ব্যাকব্রাশ!

এত মিল কী করে সম্ভব? সময় কি থেমে গেছে আচমকা? উহুঁ, তাও নয়, টাইম মেশিনে চড়ে সময়ের উল্টো দিকে ছুটছি বুঝি আমি! নইলে এই স্বপ্ন স্বপ্ন আলোয় কোন মায়া বলে এখানে উপস্থিত হল আকাশ? এই রেস্তোরাঁয়?

আকাশ চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে। পুরোন চেনা ভঙ্গি। কত যুগ আগের সেই দুরন্ত তরুণ।

মুখ দিয়ে আপনা আপনি বেরিয়ে এল, –অ্যাবসার্ড। হতেই পারে না।

শুভেন্দু এক মনে মেন্যুকার্ড গিলে চলেছে। এখনও। যেন ক্লাসের লেকচার ঝালিয়ে নিচ্ছে। বোধহয় স্পষ্ট শুনতে পায়নি কথাটা। মুখ তুলে বলল,– কিছু বলছ?

রিয়ার অবশ্য কানে গেছে। জিজ্ঞেস করল, – কী অ্যাবসার্ড মা?

উত্তেজনা চাপতে পারলাম না। নিচু গলায় বললাম,– দ্যাখ দ্যাখ....ওদিকে তাকা।

রিয়া থতমত,– কী দেখব?

–ওই যে, ওদিকটায়। বাঁ পাশে থার্ড টেবিলের ছেলেটা....!

ঘাড় ঘুরিয়ে ঝলক দেখল রিয়া। পলকে ফিরিয়েও নিয়েছে মুখ, –দেখলাম। তো?

–ছেলেটাকে আমি চিনি।

–ওই ছেলেটা কে? তুমি?

–হ্যাঁ রে। ও আমার ভীষণ চেনা।

–মা প্লিজ, ওভাবে হাঁ করে তাকিয়ে থেকো না। ছেলেটা কী ভাববে?

শুভেন্দু এখনও বোঝেনি কিছু। চোখ পিটপিট করছে,– কী ব্যাপার? কাকে দেখাদেখি হচ্ছে?

চোখের ইশারায় ফের বললাম, –ওই ছেলেটাকে।

–কোথায়?

–ওই তো.....!

শুভেন্দুও নিরীক্ষণ করছে এবার। বলল, –বাহ্, ছোকরার ফিজিকটা দারুণ তো! মনে হয় পাঞ্জাবী। মোনা

পাঞ্জাবী।

সঙ্গে সঙ্গে রিয়ার গলায় কিশোরীর অস্বস্তির চাপা ধমক, – আহ্, কী করছ কী তোমরা? বলছি যে, ওভাবে দেখো না! বলে নিজেও টুক করে আর একবার দেখে নিল তিন সদস্যের পরিবারটিকে। ফিসফিস করছে, –ছেলেটার মা কিন্তু তোমাদের লক্ষ্য করছে।

ছেলেটির পাশে সালোয়ার কামিজ পরা মহিলা আমারই সমবয়সী। চল্লিশের এক আধ বছর এপাশে কি ওপাশে। ভারী, গোলগাল ফিগার। হালকা নীল আলোতেও পরিষ্কার বোঝা যায় প্রচুর প্রসাধন করেছে মহিলা। পাকা ডালিমের মতো টসটস করছে গাল দুটো। ফোলা ফোলা ঠোঁটে গাঢ় ওষ্ঠ রঞ্জনী, মোটা করে কাজল টেনেছে চোখে, চুল টেনে চূড়ো করে বাঁধা। তবে ওই মুখের সঙ্গে ছেলেটার মুখের একটু মিল নেই। মহিলা যদি মা হয়, তাহলে এদিকে পিঠ করে বসা প্রকাণ্ড চেহারার লোকটা কি বাবা? পরনে পাঠান পাঞ্জাবী? মাথার পেছনে ছোট্ট মুটে টাক? বাপ রে, কী মোটা কী মোটা! যেন এক ফালি হিমালয়। পাহাড় একটু নড়াচড়া করলেই হারিয়ে যাচ্ছে ছেলেটা। টুকি দিয়ে লুকিয়ে পড়ার মতো।

তখনই চড়াং করে মস্তিষ্কে কারেন্ট। পাহাড়টাই আকাশ নয় তো? হতেও তো পারে। মাঝে তো কম বছর যায়নি, সময় তো অনেক কিছুই বদলে দেয়। শরীর, মন। জীবনের অভিমুখ। দিয়েছেও তো। আমিও কি কম বদলেছি? অষ্টাদশী রোহিনীর কতটুকু আর অবশিষ্ট আছে এই বিয়াল্লিশ ছুঁই ছুঁই রোহিনীতে? দীর্ঘ সময় বেয়ে রূপ থেকে রূপান্তরে যেতে যেতে রোহিনী মিত্র কবেই পুরোন পরিচয় মুছে ফেলে এখন মিসেস বাসু। শুভেন্দু বসুর স্ত্রী। রিয়ার মা। এক সময়ের সদ্য যুবতী রোহিনীকে কি আমিই এখন চিনতে পারব?

কিন্তু আকাশ এখানে আসবে কোত্থেকে? সে কি চন্ডীগড়েই থাকে? নাকি বেড়াতে এসেছে? আমাদেরই মতো?

তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে কৌতূহল। অতীতকেও মিলিয়ে নেয়ার। অতীতের সঙ্গে মিল খোঁজার। থাকতে না পেরে বলেই ফেললাম,– দাঁড়াও, সামনে গিয়ে একবার ভাল করে দেখে আসি।

শুনেই রিয়া চোখ পাকাচ্ছে,– খবরদার মা, একদম নয়।

–কেন? গেলে কী হয়?

–না। মোটেই যাবে না। বয়স বাড়ছে? না কমছে?

বাব্বা, মেয়ের সামনের কী বহর! খুবই বিরক্ত হয়েছে মেয়ে। বিব্রতও । রিয়ার বয়সী হলে আমিও হয়তো হতাম। ওই বয়সের ধর্মই তো এই। যত ব্রীড়া, যত সংকোচ, যত পরদা টানা....

পালংভাজা এসে গেল টেবিলে। ধোঁয়া ওঠা থাই স্যুপও। খাবার ভাগ করতে করতে আবার একবার তাকালাম আড়চোখে। দণ্ডায়মান ওয়েটারের আড়ালে এই মুহূর্তে ঢাকা পড়ে গেছে যুবক। আছে তো এখনও? নাকি উঠে গেল?

শুভেন্দু তাড়িয়ে তাড়িয়ে মুচমুচে পালংভাজা চিবোচ্ছে। মেয়েকে জিজ্ঞেস করল,

–কী রে, মেন কোর্স ডিসাইড করলি?

রিয়া মেন্যুকার্ড খুলল ফের, – মা তো চাউমিন ভালবাসে, মার জন্য একটা নুডলসের প্লেট নিয়ে নিই? আর একটা সি-ফুড ফ্রায়েড রাইস?

–হ্যাঁ হ্যাঁ, দু'প্লেটই তিনজনের জন্য এনাফ।

-সাইড ডিশ কী বলব?

–তুইই বল্।

–প্রন্ নিই এক প্লেট? কী মা, কী নেব প্রনের?

–নে না যা হোক কিছু। তুইই তো পছন্দ করবি। আমি তো.....

সহসা বাকরুদ্ধ হয়েছে আমার। শিরদাঁড়া টানটান। পাহাড় উঠে দাঁড়িয়েছে। ঘুরল! এদিকেই আসছে! টয়লেটে যাবে বোধ হয়। মুখটা সামনা সামনি হতে আমি নিথর।

আকাশ। হ্যাঁ, আকাশই। আকাশ কাপুর। ওই বিপুল দেহ, মেধ ভরা গাল, গলা চিবুক সবকিছুকে ছাপিয়েও ও মুখ পলকে চিনে ফেলা যায়। এত বছর পরেও।

[দুই]

আমাকে চিনতে আকাশের অবশ্য সময় লাগল না একটুও। চোখাচোখি হওয়া মাত্র ফেটে পড়েছে বিস্ময়ে,– রোহিনী? তুম্? তুম ইঁহা?

রেস্তোরাঁর চাপা গুঞ্জন বুঝি স্তব্ধ হয়ে গেল বাজখাই গলায়। আশপাশের লোক ঘুরে দেখছে দৈত্যের মতো মানুষটাকে।

আকাশের এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই। আবার গুমগুম করে উঠল ভরাট স্বর। প্রতিধ্বনির মতো।

–আরে রোহিনী? তুমি এখানে কী করে?

রোহিনী। রোহিনী। রোহিনী।

.....–অ্যাই, রহিনী নয়, চলো রহিনী। রোও হিইনাই।

–রহিনী।

–ত্যাৎ, হচ্ছে না। আবার বলো।

–আমার রহিনীই ঠিক আছে।

–তুমি রোহিনী মানে জানো?

–হোগা কুছ। উসমে মেরা কেয়া মতলব?

–রোহিনী একটা নক্ষত্রের নাম। স্টার। বুঝেছ বুদ্ধুরাম?

–বাহ্, আকাশের সঙ্গে তব তো তোমার গহেরা সম্বন্ধ?

–আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। রোহিনী থাকে আকাশের বুকে।

–থাকবে তো জিন্দেগি ভর?

–উহুঁ, সূর্য উঠলেই আমি মিলিয়ে যাব।

–কভি নেহি। অ্যায়সা কভি হোবেই না।.....

মস্তিষ্কে আছাড় খাচ্ছে স্মৃতি। কেমন যেন বোকা হয়ে গেছি। চেষ্টা করেও হাসি ফোটাতে পারছি না ঠোঁটে।

আকাশ দুপদাপিয়ে টেবিলের সামনে, – কী ম্যাডাম, মনে হচ্ছে যেন চিনতে পারছ না?

দ্রুত সম্বিতে ফিরলাম। ছি ছি, কী না কী ভাবছে শুভেন্দু আর রিয়া! এই বয়সে বেশি আবেগতাড়িত হয়ে যাওয়া কি মানায়?

জোর করে চোয়াল ফাঁক করেছি,– কী করে চিনব? যা একখানা হিমালয় মার্কা চেহারা করেছ! তোমার ছেলেকে না দেখলে তো জীবনেও চিনতে পারতাম না।

–তুমি ভি বহুৎ চেঞ্জড হয়ে গেছ। গাল ওয়াল ফুলে গেছে, থোড়ি মোটি ভি হয়েছ....। সভ্যতা ভব্যতার নিয়ম ভেঙে হা হা হেসে উঠল আকাশ। যেন এটা একটা মানুষ ভর্তি রেস্তোরাঁ নয়, যেন একটা খোলা প্রান্তর, যেন আশপাশে জনপ্রাণীটি নেই!

হাসতে হাসতেই আকাশ দেখে নিচ্ছে শুভেন্দু আর রিয়াকে। শুভেন্দুকে বলল,

–জোর ঘাবড়ে গেছেন তো? আমি আকাশ। আকাশ কাপুর। ওয়ান্স আই ওয়াজ ইন ক্যাল। কলেজে পড়ার সময়ে রহিনী আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিল। আই মিন গার্লফ্রেন্ড।

কী সর্বনেশে লোক রে বাবা ! মুখের কোনও রাখঢাক নেই!

চোখ পাকিয়ে বললাম,– অ্যাই, হচ্ছেটা কী, অ্যাঁ? ফাজলামি করার অভ্যেসটা এখনও গেল না?

–ঝুট তো বলিনি। আকাশ দমবার পাত্র নয়,– তুমি আমার চেয়ে দো ক্লাস জুনিয়র ছিলে ঠিকই, তবে উই ওয়্যার ...

–বুঝেছি, বুঝেছি। শুভেন্দু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আপনাদের সম্পর্কটা একটু অন্য রকমের ছিল।

বাহ্। বাহ্। আমার বরটিও দেখি চ্যাংড়ামিতে কম যায় না। দু'জনকেই এক্ষুণি থামানো দরকার। নইলে মেয়ের সামনে কে আবার কী বলে ফেলে!

ঝটপট চলে গেলাম পরিচয় পর্বে,– মিট মাই হাজব্যান্ড শুভেন্দু বাসু। কলেজে পড়ায়। কেমিস্ট্রি। ... আর এ আমার একমাত্র মেয়ে। রিয়া।

আকাশ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে শুভেন্দুর দিকে, –আমি বেশি পড়ালিখা শিখিনি প্রফেসর সাব। গ্র্যাজুয়েশানেই খেল খতম। এখোন চন্ডীগড়মে ছোটা মোটা ধান্দা করি। একঠো বেকারি আছে। বিস্কিট ব্রেড বানিয়ে দিন গুজরান করি।

শুভেন্দুও হাত বাড়িয়ে দিল, –আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।

–বসব তো জরুর। কিতনি সাল বাদ রহিনীর সঙ্গে দেখা হোল... মোর দ্যান টোয়েন্টি ইয়ারস। তাই না রহিনী?

হিন্দি ইংরেজি আর ভাঙা ভাঙা বাংলা মিশিয়ে বিচিত্র এক জগাখিচুরি ভাষায় কথা বলছে আকাশ। ভারী শরীরখানা চেয়ারে নামিয়ে রিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক পল,

–হোয়াট এ লাভলী গার্ল। জাস্ট লাইক এ বাডিং ফ্লাওয়ার। রহিনী, তোমার লড়কি তোমার থেকে ভি বিউটিফুল হয়েছে।

এমন স্তুতিতে কোন্ কিশোরী না পুলকিত হয়। ফিক করে হেসে ফেলল রিয়া।

–অ্যাই মেয়ে, আমার বেটার সঙ্গে ফ্রেন্ডাশিপ করবে?

প্রশ্ন করে উত্তরের অপেক্ষায় থাকল না আকাশ, সঙ্গে সঙ্গে ডাকাডাকি শুরু করেছে বউ ছেলেকে, – পুনম? আমন? তুমলোগ ইধার আ যাও। জলদি। দেখো কৌন হ্যায় এ লোগ। হ্যাভ এ প্লেজ্যান্ট সারপ্রাইজ টুনাইট ।

ওফ্, কী হৈহৈ যে আরম্ভ করল আকাশ! সব্বাইকে এনে, চেয়ার টেয়ার টেনে, টেবিল জোড়া লাগিয়ে আসর জমিয়ে ফেলল রীতিমত। একাই বকে যাচ্ছে। কথায়-ব্যবহারে-হাসিতে বিন্দুমাত্র জড়তার আভাস নেই। এই

আকাশ আগের আকাশের চেয়ে অনেক বেশি উচ্ছল। প্রাণবন্ত। হাসছে, চেঁচাচ্ছে, দুমদাম বেফাঁস কথা বলে নাকাল করছে আমাকে।

–জানেন প্রোফেসার সাব, কী করে আমাদের পহেলি মোলাকাৎ হয়েছিল? বহুৎ বারিশ ছিল সেদিন। বাসস্ট্যান্ডে দেখি রহিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। স্ট্রেট কাছে গিয়ে বললাম, আ যাও ইয়ার, মেরি ছাতিপে আ যাও। আপ ছাতিকে মিনিং সমঝতে হ্যায় না প্রোফেসার সাব? আপকো বাংলামে আমব্রেলা, অউর হামারি হিন্দিমে চেস্ট। হা হা হা।

আকাশের খোলামেলা হাবভাবে রিয়ার সংকোচ কেটে গেছে। মুচকি হেসে বলল– আপনি বৃহৎ স্ট্রেট ফরোয়ার্ড ছিলেন তো আংকল?

–অফকোর্স। জাস্ট লাইক ইওর জেনারেশান। লেকিন ইৎনা অ্যাডভান্সড হোনেকে রাওজুৎ ভি তোমার মাম্মি আমাকে দিল সে হঠিয়ে দিল। কেয়া করে, রোতে রোতে চলা আয়া চন্ডীগড়। আমার নসিবে তোমার এই পুনম আন্টিই লিখা ছিল, ইসকি সাথ হি বসা লিয়া ঘর।

শুভেন্দু হাসতে হাসতে বলল– তাতে কিন্তু আপনার লস কিছু হয়নি। আপনার মিসেস যথেষ্ট সুন্দরী।

–সে তো শাদিকে বাদ আমার সঙ্গে থাকতে থাকতে হয়েছে। পহেলে বহুৎ কালী থি, ভূতনি থি। ম্যায়নে পালিশ লাগাকে উনকো গোরি বানায়া। বলেই বউ-এর পিঠে একটা জোর চাপড়,– কেয়া পুনমজী, ঠিক বোলা?

পুনম জবাব দেবে কী, কুটিপাটি হচ্ছে হেসে। বোঝাই যায় আকাশের এই ধরনের রঙ্গ রসিকতায় সে দিব্যি অভ্যস্ত। এমনকি তার ছেলেও।

আমারই শুধু খুব অবাক লাগছিল। এককালে আমার জন্য পাগল হওয়া সেই প্রেমিকটিকে যেন চিনেও চিনতে পারছি না এখন। মনে হচ্ছে আমাকে দেখে এত খুশি হওয়াটা যেন নেহাৎই হঠাৎ কোনও পুরোন বন্ধুকে দেখে ভীষণ ভাল লাগার মতো। ব্যস, ওইটুকুই, তার বেশি কিছু নয়। যেন পুরোন সব অভিমান-অপমান-যন্ত্রণাকে সময়ের স্রোতে বাসী ফুলের মতো ভাসিয়ে দিয়েছে আকাশ। এক সময়ের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের স্মৃতিগুলো বোধহয় আকাশের কাছে এখন বহু যুগ আগে দেখা কোনও রোমান্টিক প্রেমের দৃশ্য মাত্র। আবছা নস্টালজিয়া।

বুকটা চিন চিন করে উঠল হঠাৎ। সময় কি অতীতকে এভাবেই পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেয়? কিছুই কি পড়ে থাকে না? কোনও নালিশ? কোনও দীর্ঘশ্বাস? ভাণ করছে না তো আকাশ? ভুলে থাকার নিপুণ অভিনয়? হাসি-ঠাট্টার মোড়ক পরিয়ে অতীতের তেতো দিনগুলোকে স্মরণ না করার চেষ্টা?

নিশ্চয়ই তাই। নইলে আমরা পরশুই চন্ডীগড় ছেড়ে চলে যাব শুনে দুম করে আটকানোর চেষ্টাই বা করবে কেন?

শুভেন্দুর ট্যুর প্রোগ্রাম শুনে হাঁ হাঁ করে উঠেছে আকাশ,– না প্রোফেসার সাব, ইৎনি জলদি চন্ডীগড় ছেড়ে আপনাদের যাওয়া হবে না। আমাদের ইউনিক সিটি চন্ডীগড় আগে দেখুন ভাল করে। আমাদের ভি দেখুন। পরয়ানু চলুন একদিন। রোপওয়ে চড়ে এ পাহাড়সে, ও পাহাড়।

রিয়া চোখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল– পরয়ানু? যেখানে ক'দিন আগে একটা বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল? রোপওয়ে ছিঁড়ে অনেকগুলো লোক মারা গেল?

–রোজই কি রোপওয়ে ছিঁড়বে বেটি? ও তো অ্যাক্সিডেন্ট, একবারই হয়।

শুভেন্দু সভয়ে বলল– কিন্তু রিস্ক তো আছে?

–আরে প্রোফেসার সাব, রিস্ক না থাকলে লাইফে মজা কোথায়? আমাকেই দেখুন না। কতবার তো দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছি, ফিরভি উঠে পড়ছি, ঝুলে যাচ্ছি দড়ি ধরে। তিন তিনটে বিজনেস ফেল করল, চৌথা বেওসা লেগে

গেল।

–ওটা তো জীবন সংগ্রাম। এ যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি!

–দেখুন প্রোফেসার সাব, এই চন্ডীগড়ের আশপাশমেই তো কিৎনা টেররিন্ট অ্যাক্টিভিটি ছিল। রোজ খুন, রোজ গোলি, হর রোজ বোম ব্লাস্ট...। তার মধ্যেই তো আমরা বেঁচে রইলাম। আর ডেঞ্জার কোথায় নেই? আপনাদের কলকাতামেই তো নকশাল মুভমেন্ট হয়েছিল, মরেওছিল কত লোক, তার জন্য কি আপনারা কলকাতা ছেড়ে চলে গেছিলেন? জীবন তো আছেই চলে যাওয়ার জন্য। ঠিক কি না? রিস্ক এখানে নেব নাই বা কেন?

এই ধরনের সংলাপ অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের খুব পছন্দ। রিয়া সঙ্গে সঙ্গে আকাশের দলে,– ইউ আর রাইট আংকল। আমি পরয়ানু যাব।

–গুড। গুড। এখানে আরও কত কী দেখার আছে, সব দেখে নাও। আমনের সাথে ঘুরতে পারো। আমনের মোটরসাইকেল আছে, তোমাকে নিয়ে হুই চলে যাবে। রক গার্ডেন দেখো, জাকির গোলাপবাগ দেখো, শুখনা লেক দেখো...। নেকচাঁদের হাতে তৈরি রক গার্ডেন দেখলে তাজ্জব বনে যাবে। ঘাটিয়া চিজ মে কেয়া নেহি বানায়া!

আকাশের উৎসাহে জল দিয়ে আমি বলে উঠলাম– আমরা আজ দুপুরেই গেছিলাম রক গার্ডেনে। খুব ভাল লেগেছে।

–আবার যাবে। আমি আর তুমি। প্রোফেসার সাব আর পুনম। আমন আর গুড়িয়া। হা হা হা।

মাগো মা, এই লোকটার সঙ্গে কি একটা কথা বলারও উপায় নেই এখন? ভ্রূকুটি হেনে বললাম, –এক জিনিস বারবার দেখতে আমার ভাল লাগে না আকাশ।

–ঠিক হ্যায়। মৎ যাও। কিন্তু এখানে তোমাদের থাকতেই হবে। কম সে কম সাত দিন। কোনও এক্সকিউজ আমি শুনছি না।

এবার শুভেন্দুর হাল ধরার পালা। ঠাণ্ডা মাথার লোক, মোলায়েম করে বোঝাচ্ছে আকাশকে,– দেখুন মিস্টার কাপুর, ব্যাপারটা কী হয়েছে জানেন তো, আমার কলেজের ছুটি খুব লিমিটেড। রিয়ারও স্কুল খুলে যাবে। কুলু মানালি যাব বলে বেরিয়েছি....

–যাইয়ে না। কৌন রোখা হ্যায় আপকো? মগর উসকে পহলে আমাদের এখানে থাকতেই হবে, ব্যস। কালই আপনারা হোটেল ছেড়ে আমার গরীবখানায় চলে আসুন।

শুভেন্দু প্রায় আঁতকে উঠল,– আপনার বাড়িতে?

–শিওর। হোয়াই নট? মেহেমানই যদি না এল, ঘর বানিয়ে লাভ কি আছে বলুন? বলেই আকাশ চোখ মারছে,– ঘাবড়াইয়ে মৎ প্রোফেসার সাব। আপনার বিবিকে আমি কেড়ে নেব না।

–আহা। শুভেন্দুও ঠাট্টা জুড়েছে,– সে সৌভাগ্য কি আমার হবে?

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল আকাশ। মাথা দুলিয়ে তারিফ করল শুভেন্দুকে।

খাবার এসে গেছে। দু'টেবিলেরই। মিলিয়ে মিশিয়ে ভাগ যোগ করে সারা হল আহারপর্ব। রিয়ার সঙ্গে আমনের বেশ ভাব হয়ে গেছে। এর মধ্যেই। আমন একদমই বাংলা বোঝে না, ইংরেজিতে কথা চালাচ্ছে দু'জনে। আমন কলেজে পড়ে, সে শোনাচ্ছে এখানকার কলেজের হালচাল। আর রিয়া কলকাতার স্কুলের। সঙ্গে সঙ্গে তাজমহল, আগ্রা ফোর্ট, ফতেপুর সিক্রি, কুতুবমিনারও চলে আসছে গল্পে। শীতে সিমলা গিয়ে আমনরা কেমন বরফ পেয়েছিল সে কাহিনীও শোনা হয়ে গেল রিয়ার। আজকালকার ছেলেমেয়েরা কত সহজে

আলাপ জমিয়ে ফেলতে পারে। আজ আকাশ যত গল্পোই ঝাড় ক, আমার সঙ্গে ভাল করে পরিচয় জমাতে পাক্কা তিন মাস সময় লেগেছিল আকাশের।

খেতে খেতে আকাশ আর শুভেন্দুও গল্প করছিল টুকটাক। আমি আর পুনমও। পুনম ভাল ইংরেজি জানে না, আমিও হিন্দি বলতে গিয়ে হিমশিম। হোঁচট খেতে খেতেই জেনে ফেললাম পুনমের বাবা মিলিটারিতে ছিলেন একসময়ে, এখন থাকেন কারনালে, প্রায় সত্তর বছর বয়সেও খেতিবাড়ি করেন নিজের হাতে। দু'ভায়ের একজন থিতু হয়েছে দিল্লিতে, অন্য জন উড়ে গেছে কানাডায়। প্রকাণ্ড স্বামী আর রূপবান পুত্রটিকে নিয়ে পুনম একজন সুখী গৃহিণী।

আহার শেষ হতে না হতেই আর এক বিভ্রাট। পকেট থেকে শুভেন্দু পার্স বার করতেই তার হাত চেপে ধরেছে আকাশ, কিছুতেই তাকে বিল মেটাতে দেবে না, –নেহি প্রোফেসার সাব, আমারই সিটিতে এসে, আমারই গার্লফ্রেন্ডের সামনে আমাকে বেইজ্জৎ করবেন?

–আহা, ওভাবে নিচ্ছেন কেন? আপনাদের সঙ্গে আমাদের তো চান্স মিটিং।

–তো কী আছে? সঙ্গে সঙ্গেই তো আমার গেস্ট বনে গেছেন।

–না না, অন্য একদিন খাওয়াবেন। আজ নয়। প্লিজ।

–তাহলে কথা দিচ্ছেন তো চন্ডীগড়ে থাকবেন? কালই চলে আসবেন আমাদের বাড়ি? শুভেন্দু আমার দিকে তাকাল। আমি শুভেন্দুর দিকে।

কী ফ্যাসাদ!

বুঝে গেলাম দু'চারটি দিন আরও থাকতেই হবে চন্ডীগড়ে।

[তিন]

হোটেলে ফিরেই পিছনে লেগে গেল রিয়া, –ওয়াও! কী একটা সাংঘাতিক বয়ফ্রেন্ড ছিল তোমার মা! আগে তো কখনও এর কথা বলোনি?

অস্বস্তিটা গোপন করে হেসে বললাম,– আমারই কি ছাই মনে ছিল, যে বলব!

শুভেন্দু টুকুস করে মন্তব্য করল– ওর পাশে তোর মাকে কেমন লাগছিল দেখেছিলি? পর্বতের পাশে মুষিক! তোর মা লোকটার একদম কোমরের কাছে।

–মোটেই না। আমি একদম কাঁধ বরাবর। তাছাড়া আকাশ মোটেই আগে এরকম দৈত্যের মতো ছিল না।

–কুড়ি-পঁচিশ বছরে অতটা বেড়ে গেছে বলছ?

–মুটিয়েছে তো বটেই। তবে আগে স্লিমই ছিল। হুবহু ওর ছেলেটার মতো। রিয়া বিছানায় টানটান হয়ে বসেছে। বলল,– আমন কিন্তু সত্যিই হ্যান্ডসাম। তবে মনে হল একটু ইনট্রোভার্ট টাইপ। শাই ধরনের। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কথা বলতে হয়।

শুভেন্দু প্যান্ট-শার্ট বদলে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে নিয়েছে। সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল,– খোঁচাখুঁচি করে কী জানলি?

–এমনিই। সাধারণ কথা।

–আমনের মাও তো বেশ চুপচাপ।

–না হয়ে উপায় আছে? আংকল যে নিজেই একা ব্যাটিং করে যায়।

বাপ-মায়ের আলাপচারিতা চলছে। টুক করে ঘুরে এলাম বাথরুম থেকে। শাড়ি ছেড়ে পরে নিয়েছি নাইটি। বড়সড় একটা ড্রেসিংটেবিল আছে হোটেলের রুমটায়, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছি চেপে চেপে।

সিগারেট শেষ করে একটা সায়েন্স জার্নাল খুলল শুভেন্দু। নেশা। সোফায় বসে বইটা উল্টোতে উল্টোতে বলল,– কাজের কথাটা কিছু ভাবলে?

ঘুরে তাকালাম– কী বলো তো?

–কী করবে এখন? তোমার বন্ধুটি যা পাগল, কাল যদি সকালে এসে হাজির হয়?

চিন্তাটা আমার মনেও ঘুরপাক খাচ্ছে। বললাম,– তোমরাই ঠিক করো কী করবে।

–আমি কিন্তু কারুর বাড়ি ফাড়ি গিয়ে থাকতে পারব না। তাছাড়া কুলু মানালির জন্য অলরেডি গাড়ি বুক করে ফেলেছি, ক্যানসেল করলে টাকাটা গচ্ছা যাবে।

–এটা তখনই বলে দিতে পারতে।

–আমার বলাটা ভাল দেখাত? তোমার বন্ধু, বললে তুমি বলবে।

–দেখলে তো কেমন ঝুলোঝুলি করছিল। একা আকাশ নয়, পুনমও। কীভাবে হাত ধরে রিকোয়েস্ট করে বলল, আপলোগকো রহেনাই হোগা! কাল হি চলে আইয়ে! ঝপ করে মুখের ওপর না বলে দেয়া যায়?

–হুম। প্রবলেম। গভীর গাড্ডা।

রিয়া আমাদের কথা গিলছিল। বলে উঠল– একটা কাজ তো করতেই পারি। দু'তিনটে দিন এখানে থেকে যাওয়াই যায়।

শুভেন্দুর চোখ টেরচা হল,– কুলু মানালিতে থাকা কিছু তাহলে কমে যাবে।

–তা কেন! কুলু মানালির পোরশানটা অ্যাজ ইট ইজ রাখো, সিমলা ক্যানসেল করে দাও। তবে মা, আমরা কিন্তু এখানেই থাকব। এই হোটেলেই। ওদের ওখানে থাকার ব্যাপারটা তোমাকেই ক্যানসেল করতে হবে।

শুভেন্দু বলল, – অবশ্যই। কারুর বাড়ি-টাড়িতে গিয়ে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। ওটা তুমিই কাটাবে।

ফতোয়া জারি করে শুভেন্দু খালাস। উঠে পড়ল বই রেখে। বাথরুম যাওয়ার জন্য তোয়ালে তুলে নিয়েছে কাঁধে। কলকাতায় দু'বেলা স্নান করা অভ্যেস, এখানে এসেও তার ব্যত্যয় ঘটতে দেবে না। অবশ্য অক্টোবরের মাঝামাঝিতেও চন্ডীগড়ে এখন বেশ গরম, স্নান করলে শরীরটা ঝরঝরেই হবে।

কিন্তু আমি যে কী করি? কী করে যে কথাটা বলি আকাশকে? ওর বাড়িতে গিয়ে ওঠার আমারও কণামাত্র ইচ্ছে নেই। আর থাকবই বা কেন? অনেক দিন পর দেখা হয়েছে, কথা হল, ভাল লাগল, ব্যস্। বেশি মাখামাখি করার দরকারটাই বা কী? প্রায় অচেনা একটা বাড়িতে হাঁসফাঁস করে মরি আর কি!

আশ্চর্য, ভাবনাটাই কী অদ্ভুত! পায়ে পায়ে রুমের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালাম। সামনে চওড়া রাস্তা। শুনশান। হ্যালোজেনের আলোয় দিন হয়ে আছে পথঘাট। ওপারে সার সার গাছ। নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। ছায়া ছায়া হয়ে।

আনমনে গাছই দেখছি। নাকি নিজেকে? কী বদল, কী বদল! যে আকাশকে একদিন না দেখলে ছটফট করতাম, আজ তাকেই এড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। পরিবেশ, অভ্যাস, সময় এক্কেবারে অন্য রকম করে দিয়েছে মনের গঠনটাকে। সাময়িক আবেগ দিয়ে অতীতকে একটুখানি ছুঁয়ে দেখতেই শুধু ভাল লাগে যেন। এ কি এক ধরনের দুঃখবিলাস? হবেও বা।

পুরোন কথা মনে পড়ছিল। একের পর এক। আকাশের সঙ্গে প্রথম পরিচয়, একটু একটু করে সম্পর্ক গাঢ় হওয়া, সিনেমা হল, ভিক্টোরিয়া, গঙ্গার পাড়.....। পরস্পরের হাত ছুঁয়ে বসে থাকা। নিষ্পন্দ হয়ে শোনা কেমন কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে গঙ্গা। কী বলত সেই নদী? আকাশকে দূরে ঠেলে দিয়েও সুছন্দে বয়ে যাবে রোহিনীর জীবন? কেন ছেড়েছিলাম আকাশকে? শুধুই বাড়ির অমত ছিল বলে? ছোটকাকা একদিন অফিসফের তা দেখে ফেলেছিল আমাদের । গঙ্গার পাড়ে। বাড়ি ফিরেই রিপোর্ট করেছিল বাবাকে। সেই রাত্রেই বাবার জেরার মুখে লুকিয়ে রাখতে পারিনি আমাদের সম্পর্কটাকে। বাবা সাফ সাফ জানিয়ে দিল, কিছুতেই কোনও অবাঙালি ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে না। যদি জেদ করি ঘাড় ধরে বের করে দেবে বাড়ি থেকে। বাবার ভয়েই কি পিছিয়ে এসেছিলাম? মা পাখিপড়ার মতো করে বুঝিয়েছিল, এমন ভুল করিস না ঝুনু। ওদের আর আমাদের কালচার মিলবে না। ভিন্ন ধারার সংসারে গিয়ে তুই অসুখী হবি, ছটফট করবি। তেলে জলে মিশ খাবে না ভেবেই কি আর এগোলাম না? মেঝকাকা বলেছিল, ছেলের বাপের ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা, মানে আদতে লরিওয়ালা। একটা লরিওয়ালার ছেলেকে বিয়ে করে তুই মিত্তির বংশের সুনাম ডোবাবি? নিজের পরিবারের শিক্ষাদীক্ষার কথা একবারও ভাববি না? ভেবেছিলাম বলেই কি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম আকাশকে?

নাকি এর কোনওটাই নয়? আকাশ ছিল নিছকই খেলা? যৌবনের নেশায় মাতলামি? নিজের চেনাশোনা গন্ডীর বাইরে বেরোব না, এই সিদ্ধান্তটা বুঝি আগাগোড়াই আমার ভেতরে ছিল আমার।

-কী গো, কী করছ এখানে দাঁড়িয়ে?

চমকে ফিরলাম। শুভেন্দু।

– স্নান হয়ে গেল তোমার?

–হুম্।

–আমিও ভাবছি গা'টা ধুয়ে আসি। কেমন জ্বালাজ্বালা করছে।

– দেখে কোরো। চোরা ঠাণ্ডা আছে কিন্তু। স্নানের সময়ে টের পাচ্ছিলাম।

– তাই বুঝি? তাহলে থাক। .....রিয়া কী করছে?

–সে তো ফ্ল্যাট। ভোঁস ভোঁস ঘুমোচ্ছে। তুমিও শুয়ে পড়ো, রাত কোরো না।

– যাই।

শুভেন্দু চলে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়েছে। পাশে এসে রগুড়ে গলায় বলল, –এই, তোমার সঙ্গে ওই আকাশ কাপুরের সত্যি সত্যি প্রেম-টেম ছিল নাকি?

আপাত প্রফেসর সাহেবের মনেও তাহলে প্রশ্ন জেগেছে? হেসে ফেললাম, –কী মনে হয়?

– মনে হচ্ছে কিছু একটা যেন ছিল। সামথিং সামথিং।

এই বয়সে মিথ্যে বলার কোনও মানেই হয় না। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়াও নিশ্ছিদ্র। তবু কেন যেন নিখাদ সত্যিটা বেরোল না মুখ দিয়ে। বললাম, –প্রেম-টেম নয়, বন্ধুত্ব ছিল। একটু গভীর। বলতে পারো এক ধরনের মোহ।

– ইন্‌ফ্যাচুয়েশান?

–ওই আর কি। কম বয়সে যেমন থাকে আর কি। হঠাৎই আসে, আবার হঠাৎই মিলিয়ে যায়। সাবানের ফেনার মতো।

– বুঝলাম। তা উইকনেসটা কোন তরফে বেশি ছিল?

– গের্স করো।

শুভেন্দু মাথা চুলকাল। আঙ্গুল মটকাচ্ছে। তারপর বলল, – পাগলাটাই বোধহয় মজনু ছিল, তাই না?

–হুম্। শব্দটা আলগা ভাসিয়ে দিলাম হাওয়ায়।

– কাপুর সাহেবের খ্যাপামিটা এখনও আছে কিন্তু। দেখো, বুড়ো বয়সে পাহাড় টাহাড়ে যেন হারিয়ে যেও না।

নিজের ঠাট্টায় নিজেই একটু হেসে নিল শুভেন্দু। হালকা শিস দিতে দিতে ফিরল রুমে। বালিশ চাদর নিয়ে গড়িয়ে পড়ল লম্বা ডিভানটায়।

আমি এসে শুয়ে পড়েছি আলো নিবিয়ে। মেয়ের পাশে। বুজেই আছে চোখ, গড়িয়ে যাচ্ছে রাত, তবু ঘুম আসে না কেন?

উঠে বসলাম বিছানায়। খোলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছি বাইরে। দূরে, বহু দূরে, অন্ধকার মাখা কালো কালো পাহাড়। ভুতুড়ে পাহাড়গুলোর মাথায় আকাশে লালচে ভাব। মেঘ জমেছে কি? ওই পাহাড়ের ওপার থেকে ঝমঝমিয়ে এগিয়ে আসে বৃষ্টি। আজ সকালেই যেমন এসেছিল এক পশলা। অনেক দূর থেকে ক্রমে যখন কাছে এল তখন শুধুই ঝিরঝির ঝিরঝির। বর্ষণ তেমন হলই না, ক্ষীণ অস্তিত্বটুকু টের পাওয়া গেল মাত্র।

সহসাই কেঁপে উঠেছি আমি। নিজেরই অজান্তে। রেস্তোরাঁয় হঠাৎ আমনকে দেখা, দেখে ঝাঁকুনি খেয়ে যাওয়া, অকারণ আবেগের মাঝে আকাশের আবির্ভাব, এক পলকের জন্য হলেও আকাশের চোখে বিস্মৃত অতীত, কিম্বা মাঝে মাঝে পুরোন আকাশকে খুঁজতে গিয়ে আমনকে ফিরে ফিরে দেখা – এসব কি শুধুই পাহাড় থেকে নেমে আসা সকালের ওই বৃষ্টিটার মতো? নিছকই অস্তিত্ব ঘোষণা? কোনও এক হারানো সময়ের?

নাকি তার চেয়েও বেশি কিছু?

স্মৃতির পাতা থেকে ছবি উড়ে এল একটা। সেই আমাদের শেষ দেখা। না, গঙ্গার ধারে নয়, ভিক্টোরিয়ায়। দীঘির পাড়ের বেঞ্চিতে। আকাশের হাত দু'টো ধরে মিনতি করছি আমি,

–প্লিজ আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা কোরো না। পথে-ঘাটে, কলেজে, কোথথাও নয়।

–কিন্তু কেন রহিনী?

–আমি খুব বিপদে পড়ে যাব। তুমি কি তা চাও?

–তাহলে আমাদের এই রিলেশান..... ভেঙ্গে যাবে?

–দূর পাগল, এ সম্পর্ক কি ছেঁড়ে কখনও? আমি তোমার সঙ্গে ঠিক দেখা করে নেব। সময় হলেই, তুমি আমায় ততদিন একটু সাহায্য করো প্লিজ।

মিথ্যে বলেছিলাম আকাশকে। তখন তো আমার বিয়ে ঠিক। কলেজের লেকচারার শুভেন্দু বসুর সঙ্গে। শুভেন্দুর বাবা-মা এসে আশীর্বাদও করে গেছেন আমায়।

সেদিন ছলনাটা কি ধরে ফেলেছিল আকাশ? নইলে আর কখনও যেচে যোগাযোগ করেনি কেন? কে জানে, বিয়ের খবরটাও জানত হয়তো ! বুঝতে দেয়নি আমায়!

আমার বিয়ের সময়ে আকাশ কি ছিল কলকাতায়? নাকি কুৎসিত আঘাতটা বুকে নিয়ে তার আগেই ত্যাগ করেছিল শহরটাকে?

বুকটা ভারী হয়ে এল। নাহ্ কাজটা বোধহয় সেদিন ঠিক করিনি।

[চার]

সকাল হতে না হতে আকাশ হাজির।

সকাল মানে আমার সকাল। শুভেন্দু আর রিয়া ছুটির দিনে এমনিই বেলা ন'টার আগে চোখ খোলে না, বেড়াতে এসে এখন তো আরও পোয়া বারো।

বেল শুনে প্রথমে ভেবেছিলাম বেয়ারা-টেয়ারা বুঝি। বেড-টি দিতে এসেছে। দরজা খুলেই চমকে দেখি আকাশ।

উহু, আবার ভুল। আকাশ নয়, আমন। আমনের পিছনে খানিক তফাতে বিপুলদেহী আকাশ। যেন সামনে অতীত, আর পিছনে বর্তমান!

আকাশ গুমগুম বেজে উঠল, – গুড মর্নিং।..... প্রফেসর সাব কোথায়?

আর আমার গুড়িয়া ডার্লিং?

কাল থেকেই রিয়াকে গুড়িয়া গুড়িয়া করে চলেছে আকাশ। চোখ ঘুরিয়ে বললাম, –তোমার গুড়িয়া ডার্লিং–এর কিন্তু একটা নামও আছে।

–কী নাম যেন? রিয়া?

–ভাল নামও আছে একটা। যাজ্ঞসেনী।

–হোয়াট? ইয়াগগোমেনি? মানে দ্রাইপদি?

– ইয়াগ্‌গো নয়, যাজ্ঞ। দ্রাউপদি নয়, দ্রৌপদি।

পুরোন খেলাটা কি মনে পড়ল আকাশের? হাসছে মিটিমিটি, –আমি ইয়াগগোই বলতে পারব। আমার ইয়াগগোই ঠিক আছে।

–বোলো যা খুশি। এসো, এখন ভেতরে তো এসো।

বড়সড় ডবলবেড রুমের সোফায় বসালাম বাপ ছেলেকে। শুভেন্দুকেও ঠেলে তুলেছি ঘুম থেকে। রিয়া খাটে, পর্দার ওপারে। ওকে এক্ষুণি ডাকলাম না, গলার আওয়াজে মহারানীর ঘুম ভাঙে কিনা দেখা যাক।

আকাশ বসেই ছটফট করছে। শুভেন্দুকে বলল, – আপনাদের সামান-টামান রেডি?

শুভেন্দুর এখনও ঘুমের খোয়াড়ি কাটেনি। চোখ ঘসতে ঘসতে বলল, –কিসের সামান?

–বাহ, কাল কথা হয়ে গেল না! আজ থেকে আপনারা আমার ওখানে.....

শুভেন্দু আমার দিকে তাকাল। অর্থাৎ বল ঠেলে দিল আমার কোর্টেই!

ঢোক গিলে বললাম, –আকাশ, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড.....হোটেলে যখন উঠেই পড়েছি, হোটেলেই থাকি না প্লিজ।

– কেন? আমার কাছে কি তোমাদের অসুবিধে আছে?

না, তা নয়..... আসলে..... মানে..... এখানেই তো বেশ আছি। আবার সব নাড়াচাড়া করা .....।

আকাশের মুখ একটু কালো হয়ে গেল কি? বুঝতে পারার আগেই অবশ্য হেসে উঠেছে শব্দ করে, – আই নো। আই নো। আমি জানতাম তুমি যাবে না।

– ছি ছি, এ কী বলছ? ঝুপ করে বসে পড়লাম আকাশের পাশে। বাচ্চা ভোলানোর স্বরে বললাম, –আমরা তোমার জন্য, শুধু তোমাদের জন্যই, আরও তিন দিন চন্ডীগড়ে এক্সট্রা থাকছি।

হ্যাঁ, সত্যি,। এই তিন দিন তোমাদের সঙ্গে খুব ঘুরব। যদি ডাকো তো লাঞ্চ-ডিনারও করব। তোমাদের বাড়িতে। শুধু রাতটুকুই যা হোটেলে এসে.....

আকাশ হাত উল্টে দিল। বড়সড় একটা শ্বাস ফেলে বলল, – অ্যাজ ইউ উইশ। আমি কখনও কাউকে জবরদস্তি করি না রহিনী।

শুভেন্দু হাসছে ঠোঁট টিপে, –আপনি তো দেখছি খুব সেন্টিমেন্টাল!

–বুদ্ধু ভি বলতে পারেন। ..... তা চায়ে ওয়ায়ে পিলাবেন? নাকি সুখাই ভাগিয়ে দেবেন?

এমা, তাই তো! চা-টা তো আগেই বলা উচিত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে চায়ের অর্ডার দিল শুভেন্দু। ব্রেকফাস্টেরও।

হাসতে হাসতে আকাশ বলল, – ব্রেকফাস্টটা কিন্তু উপরি হয়ে যাচ্ছে প্রফেসর সাব। আমরা বাপ-বেটা কিন্তু খেয়েই বেরিয়েছি। আলুপরাটা, দহি।

– তা হোক, আমাদের সঙ্গে আবার নয় একবার.....

– কনসোলেশান?

– সে যা মনে করেন। হাসিমুখেই উঠে দাঁড়াল শুভেন্দু। বিনীতভাবে বলল, – এবার যদি অনুমতি করেন, একটু ফ্রেশ হয়ে আসি?

শুভেন্দু চলে যেতেই আকাশ আবার একটা শ্বাস ফেলল, –তুমি কিন্তু ফের আমায় খুব হার্ট করলে রহিনী।

আমন চোখ পিটপিট করে দেখছে বাবাকে। ভাগ্যিস ছেলেটা এক বর্ণ বাংলা বোঝে না! গলা যথাসম্ভব নীচু রেখে বললাম, – আমি তোমাকে কোনও দিনই ইচ্ছে করে দুঃখ দিতে চাইনি আকাশ। বিশ্বাস করো। আসলে মানুষ পরিস্থিতির কাছে কখনও কখনও এমন অসহায় হয়ে যায়!

– তাই কি ? নাকি আদমি নিজেই পরিস্থিতি বানিয়ে নেয়।

–না না, বিশ্বাস করো আমায়..... এই তোমায় ছুঁয়ে বলছি।

পলকের জন্য হাত রেখেছি আকাশের কব্জিতে। পলকের জন্য চওড়া মনিবন্ধের ওপর পড়ে থাকা আমার শ্যামলা হাতখানা দেখল আকাশ। সহজ স্বরে বলল, – ওসব কথা ছোড়ো রহিনী তোমার আমাকে পছন্দ ছিল না..... ঠিক আছে। প্রফেসর সাবকে শাদী করেছ, খুশ আছ..... এ ভি ঠিক আছে। আমি ভি বিয়েশাদী করে আচ্ছাই আছি। বলেই বোকা বোকা মুখে বসে থাকা ছেলেকে সাক্ষী মানছে, –কেয়া রে বেটা, কেয়া লাগতা হ্যায় মুঝকো? খুশ? ইয়া দুখী?

ব্যাপারটা আমনের মগজেই ঢুকল না। কিম্বা বেশিই ঢুকেছে। উনিশ কুড়ি বছরের স্মার্ট চালাক ছেলে, নির্ঘাৎ যা আন্দাজ করার করে নিয়েছে। লাজুক মুখে ঘুরিয়ে দিল প্রসঙ্গটা, –রিয়া কাঁহা হ্যায় আন্টি? আভি তক্ সো রহি হ্যায় কেয়া?

– হাঁ বেটা। মজা করে বললাম, –রিয়া বিলকুল কুম্ভকরণকি ফিমেল এডিশান হ্যায়। ইৎনা বাতচিৎকে বিচ ভি.....

বলেই পর্দার এ পাশে এসে জোরে জোরে ধাক্কা দিলাম মেয়েকে, –কী রে তুই?

কতক্ষণ থেকে আকাশ আংকলরা এসে বসে আছে.....

ধরমড় করে উঠে বসেছে রিয়া, –এমা, ডাকবে তো আমাকে!..... আমন এসেছে?

–দ্যাখো উঠে।

নাইটির উপর হাউসকোট চাপিয়ে দৌড়ে এপারে এল রিয়া। মাঝের পর্দাখানা সরিয়ে দিয়েছে দু'হাতে। রিনরিনে স্বরে বলল, –সরি আংকল। সরি আমন। ..... তোমাদের চন্ডীগড়ের ওয়েদারটা এত সুন্দর, একটু বেশিই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঝকঝকে মুখে রিয়াকে কাছে টেনে নিল আকাশ। থাবা দিয়ে ঘেঁটে দিচ্ছে রিয়ার ঝামর ঝামর চুল। দরাজ গলায় বলল, –আমাদের চন্ডীগড়ের সবকিছুই সুন্দর বেটা। জিসকো দেখনে কা আঁখ হ্যায়, ও খুদ হি দেখ্ লেতা।

–হুম?

–হাঁ বেটা। ঘুমকে তো দেখো।

রিয়া আহ্লাদে গড়ে পড়ল, –জরুর আংকল। সব দেখব। সব। আপনাদেরও।

[পাঁচ]

চন্ডীগড় শহরটার গড়ন নাকি অনেকটা মানুষের দেহের মতো। আকাশ বলছিলো। মাথার জায়গাটায় আছে সেক্রেটারিয়েট, আর বিশ্ববিদ্যালয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের অঞ্চল এর হৃৎপিণ্ড। হাত আর পায়ের মতো ছড়িয়ে আছে শিল্পাঞ্চল।

হবেও বা। আমি অতশত বুঝি না। তবে শহরটা যে সত্যিই সুন্দর এতে কোনো সন্দেহ নেই। ফরাসি স্থপতি লা করবুমিয়ের চমৎকার প্ল্যান করে বানিয়েছিলেন বটে চন্ডীগড়কে। হাইরাইজ পায় নেই-ই। যে পাড়ায় চিনে খাবার খেতে গেছিলাম সেই অঞ্চলটাই যা একটু ব্যতিক্রম। যা দু'দশটা আকাশছোঁয়া অট্টালিকা, সবই প্রায় ওখানে। বাজার অফিস আছে বলেই বোধহয় ওই ধরনের বন্দোবস্ত। বসতবাড়ি মাত্রই একতলা, কি মেরেকেটে দোতলা। সঙ্গে এক ফালি করে বাগান তো আছেই। এতো বাগান, এতো ফুল দেখে চোখের ভারী আরাম হয়। ইশ, আমাদের কলকাতাটাও যদি এমনই সাজানো-গোছানো হতো! কী চওড়া চওড়া রাস্তাঘাট রে বাবা! কী পরিচ্ছন্ন। আহা রে, আমাদের কলকাতা যে কেন এমন হয় না!

রাস্তার দু'ধারে মাঝে মাঝেই মনোরম ক্যাসিয়া গাছের সারি। বসন্তকালে গাছগুলো নাকি ফুলে ফুলে রঙিন হয়ে থাকে। এমন স্নিগ্ধ শহরে বাস করে বলেই বুঝি আকাশের মনটা এখনো এতো সবুজ।

তিন দিনে শহরটাকে মোটামুটি চষে ফেললাম আমরা। সকাল বেলা লাল টুকটুক মারুতি নিয়ে হাজির হচ্ছে আকাশ, তারপরই শুরু হচ্ছে চক্কর। দক্ষ গাইডের মতো আকাশ আমাদের চেনাচ্ছে সবকিছু।

–ওই দ্যাখো, শান্তি কুঞ্জ!

–দিস ইজ আওয়ার রোজ গার্ডেন। দি ফেমাস জাকির গুলাববাগ। দি বিগেস্ট ইন এশিয়া। জানেন প্রোফেসার সাব, এখানে কতো গুলাব গাছ আছে? ফিফটি থাউজ্যান্ড! করিব দো হাজার কিসিমের গুলাব পেয়ে যাবেন। এভরি পসিবল, কালার কা গুলাব মিল যায়েগা ইঁহা।

–দেখুন দেখুন, ওই আমাদের সেক্রেটারিয়েট। আসলি গ্র্যানাইট স্টোনে বানানো। ওর ওপর উঠে আপনি পুরো শহরকা বিউটি দেখতে পাবেন।

–ইয়ে হ্যায় চন্ডীগড়কা মিউজিয়াম। আর্ট গ্যালারি ভি। বৃহৎ পুরানা পুরানা কালেকশন আছে এখানে। বুদ্ধিষ্ট জমানার গান্ধার আর্ট, মডার্ন আর্ট, মিনিয়েচার পেন্টিং... যাওয়া হলো পরয়ানুতেও। রোপওয়ে চড়ে পাহাড়ের চূড়ায়। ওঠা-নামার সময়ে কী যে গা শিরশির করছিলো! নিচে অতলান্ত খাদ, স্রেফ একটা দড়ির ওপর ঝুলছে

আমাদের কাচঘেরা খাঁচা...। পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে মনটা অবশ্য প্রফুল্ল হয়ে গেলো বেশ। মাঠঘাট, রুপোর সুতোর মতো নদী, আকাশ, মেঘ, দূরের চন্ডীগড় শহর– শিখর থেকে সবই যেন পটে আঁকা ছবি।

সবই ভালো। সবই মধুর। শুধু একটা ব্যাপারেই আমার মন খচখচ। রিয়াকে নিয়ে। কিংবা বলা যায় রিয়া আর আমনকে নিয়ে। ওরা কি বড্ড বেশি মাখামাখি করছে না? যখন তখন আমনের মোটরসাইকেলে চড়ে বসছে রিয়া! হুঁশ করে উড়ে যাচ্ছে দু'জনে। চোখে লাগে বড়। হালকা ধমক-ধামকও দিয়েছি রিয়াকে, মেয়ে কানেই তোলে না।

আমি হয়তো বললাম– একটা আধচেনা ছেলের সঙ্গে সারাদিন চড়ে বেড়াচ্ছিস... তুই কী রে?

রিয়ার তুরন্ত জবাব– আধচেনা কেন, আমন আমার বন্ধু হয়ে গেছে।

–এর মধ্যেই বন্ধু?

–বন্ধু হওয়ার হলে এক দিনেই হয় মা। না হওয়ার হলে বিশ বছরেও হয় না। কথাটায় কোনও ইঙ্গিত আছে কি? বুঝতে পারিনি। চুপ করে গেছি।

শুভেন্দুর অবশ্য হিলদোল নেই। দিব্যি মশকরা জুড়ছে মেয়ের সঙ্গে– আজ কোন্ কোন্ মাঠে চরলি?

–আমন ওদের ইউনিভার্সিটি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলো। জানো বাপি, আমনকে যতোটা শাই বেভেছিলাম, মোটেই ততোটা নয়। ইউনিভার্সিটি ক্যান্টিনে গিয়ে দেখি ওর এক হাজারটা বন্ধু। তাদের মধ্যিখানে বসা মাত্র বাবুর কথার ফুলঝুরি ছুটছে।

–একেই বলে সঙ্গগুণ। মূকও কখনো কখনো বাচাল হয় রে।

–তাই হবে। তবে আমন যা দারুণ দারুণ জোক বলে, শুনলে হাসতে হাসতে তোমার পেট ফেটে যাবে। যা একখানা বান্টু সিং আর মান্টু সিং-এর গল্প ছাড়ল না! হিহি হিহি।

–আমন মনে হচ্ছে তোকে খুব ইমপ্রেস করে ফেলেছে?

–রিয়েলি বাপি। আমন ভীষণ কিউট।

–বাহ, বাহ! মিউট থেকে কিউট হয়েছে!... দেখিস, প্রেমে-টেমে পড়ে যাস না যেন। চন্ডীগড়ে শ্বশুরবাড়ি হলে কিন্তু মুশকিল হবে, বছরে একবারের বেশি আমাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবে না।

–ওফ বাপি, ইটস হাইট অব ইম্যাজিনেশান। প্রেমে পড়া অত সহজ নাকি?

–কী জানি বাপু, তুই যেরকম এক পায়ে খাড়া হয়ে থাকছিস! মোটরবাইকের ভেঁপু বাজল কি বাজল না, ওমনি পড়িমড়ি করে...

–বটেই তো। বটেই তো। আমিও চুপ থাকতে পারছি না আর। বলেই ফেলছি,

–পরয়ানুতেও মোটরসাইকেলে যাওয়ার দরকারটা কী ছিলো? ওই পাহাড়ি রাস্তায়?

–বা রে, মারুতি কারে ছ'জন গাদাগাদি করে যাওয়া যেত?

–ও। তার মানে আমাদের সুবিধের জন্য তুই মোটরসাইকেলে চড়ছিলো? শুনে রিয়া হাসছে ফিকফিক,–বাইকের থ্রিলই আলাদা মা।

–আমন কিন্তু বড্ড জোরে চালায়।

–সেই জন্যই তো আরো ভালো লাগে মা। আমন স্টার্ট দিলেই আশি। তারপর একশ'... ওয়াও! দু'ধারে গাছপালা সাঁই সাঁই সরে যাচ্ছে পেছনে, মুখে-চোখে জোর হাওয়ার ঝাপটা... উফ, ফ্যান্টাসটিক!

–একটা কিছু ঘটে গেলে তখন টেরটি পাবে।

–কিছু হবে না মা। মিছিমিছি ভয় পেও না তো।

প্রত্যয়ের সঙ্গেই বলে রিয়া, তবু আমি স্বস্তি পাই কই? কিসের ভয় আমার? কাকে ভয়? দুর্বার গতিকে? অ্যাক্সিডেন্টকে? নাকি শংকাটা অন্য কোথাও? আর গভীরে?

শুভেন্দুকেও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলেছি দু'একবার, মেয়েকে তুমি একটু বকছ না কেন বলো তো? হুটহাট ছেলেটার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ছে...?

শুভেন্দু আমলই দিচ্ছে না উল্টো হাসছে– আহা, ঘুরুক না একটু দু'জনে। এই বয়সে বাবা-মাদের সঙ্গে থাকতে ওদের কী আর ভালো লাগে? ওই বয়সে তোমার লাগত?

কী করে বোঝাই, ওই জন্যই তো যতো ভয় আমার। ওই বয়সটাকে যে আমি হাড়ে মজ্জায় চিনি।

রিয়া আর আমন আজও সেই বেরিয়েছে মোটরসাইকেলে। আকাশের গাড়িতে আমরা এখন তিনজন। সামনে শুভেন্দু আর আকাশ। আমি একা পিছনে।

ভাবছি। হিজিবিজি কথা। আমন-রিয়ার কথা ভাবছি। ভাবছি পুনম আকাশের কথাও। পুনম আর আকাশ আদরযত্ন করলো খুবই। এই তো আজই, আমাদের লাস্ট ডিনার খাওয়াবে বলে পুনম বেরোলই না বাড়ি থেকে, নির্ঘাত বসে বসে গাদা মনেক খানা বানাচ্ছে। মনটা একটু খুঁতখুঁতও করে উঠলো। এতো খাতিরদারির বদলে কিছুই তো করতে পারলাম না। পরশু বিকেলে শুভেন্দু একা বেরিয়ে আমনের জন্য একটা যা টিশার্ট আনতে পেরেছে, ব্যস ওটুকুই। পকেট থেকে টাকা-পয়সা বার করতেই দিচ্ছে না আকাশ। তাও জোরজার করে শুভেন্দু দু দু'বার রেস্তোরাঁর বিল মেটাল...। নাহ, আকাশ যা করলো তার বুঝি কোনো তুলনাই নেই।

আশ্চর্য, শুভেন্দুও দেখি আমার লাইনেই ভাবছে এখন! সিটে হেলান দিয়ে হঠাৎ বলে উঠলো– দারুণ কাটলো কিন্তু ক'টা দিন। আপনার দৌলতে।

-কী যে বলেন প্রোফেসার সাব, এ তো আমার ডিউটি ছিলো। আকাশ গিয়ার বদলান গাড়ির– আমার পুরোন গার্লফ্রেন্ড আমারই শহরে এসেছে, একটু না করলে আমার মান থাকে!

–তাও...। কাজকর্ম শিকেয় তুলে আপনি যেভাবে আমাদের সঙ্গ দিলেন...

–ঠাণ্ডা তো জিন্দেগি ভর থাকে সাব, ফ্রেন্ড থাকে না। আপনারা যদি আনন্দ পেয়ে থাকেন, তাহলেই আমি খুশ।

–আমরা তো আনন্দ পেয়েইছি। শুভেন্দু হাসছে– তবে সত্যি বলতে কি, সবচেয়ে বেশি এনজয় করেছে আমার মেয়ে। সারাটা দিন আমনের সঙ্গে যা টো টো করছে, আপনাদের চন্ডীগড়ের একটা ঘাসও ওর অচেনা থাকলো না।

–ঘাস চিনে গেলো! হা হা হা। ভালো বলেছেন তো! হা হা হা!... আরে, ওদেরই তো এখন মস্তি করার বয়স। ঘুরবে, ফিরবে, ... কী রোহিনী, ঠিক কী না?

আঃ, আবার কেন উঠে পড়লো ওই প্রসঙ্গ? একটুও ভালো লাগছে না আকাশের হাসিটা। তীক্ষ্ম কাচের টুকরোর মতো বিঁধছে বুকে। চোখ বুজে ফেললাম। আকাশ কি মজা পাচ্ছে? রিয়া আমনের ঘনিষ্ঠতায়? নাকি স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছে কোনো দৃশ্য?

বন্ধ চোখের পাতা কাঁপিয়ে ছুটে গেলো একটা মোটরসাইকেল। উদ্দাম গতিতে। বুক কাঁপানো শব্দ তুলে। হেলমেট মাথায় কে চালাচ্ছে ওই দ্বিচক্রযান? আমন? না আকাশ? কেওই বসে আছে তাকে ঝাপটে ধরে? রিয়া? না রোহিনী? বাতাসে উড়ে কার চুল? কার হৃদয় জুড়ে ডুবডুব মুখ?

কোথায় চলেছে মোটরসাইকেল? চন্ডীগড়েই আছে কি? নাকি ছুটছে কলকাতা ছাড়িয়ে? ছবিটাকে তাড়ানোর

জন্য চোখ খুললাম। নিজেকে আনমনা করার জন্য তাকিয়ে আছি বাইরে। জানলার ওপারে। এই মাত্র সন্ধ্যে নেমেছে শহরে। আলোর সাজে সেজে উঠছে রাস্তাঘাট। শহরটা যতো সুন্দরই হোক, বড় বেশি নির্জন। আমন-রিয়া এই শুনশান শহরে আজ কতো দূরে গেছে? কখন ফিরবে?

ওফ, আবার সেই চিন্তা! আচমকা আমার স্বর রুক্ষ হলো। বললাম– আকাশ, এবার বাড়ি চলো।

–জলদি কেয়া হ্যায় ভাই? সেক্টর সেভেনটিন মে চলো, থোড়া মার্কেটিং ওয়ারকেটিং করো...

–না। বাড়িই চলো।

[ছয়]

আকাশের বাড়িটা সেক্টর বাইশে। দোতলা। গেট দিয়ে ঢুকতেই সামনে নিয়মমাফিক ফুলের বাগান, ঘন সবুজ লন। একতলায় প্রকাণ্ড ড্রয়িং-ডাইনিং হল, ঝকঝকে আধুনিক কিচেন, স্টোর। দোতলায় বেডরুম। শোয়ার ঘরগুলোর সামনে, গাড়ি বারান্দায় মাথায় বড়সড় একখানা ছাদ। কিংবা টেরেসও বলা যায়। ছাদের আলসে ঘিরে সারসার বাহারী ফুলের টব। পমপম জিনিয়া চন্দ্রমল্লিকা ফুটেছে।

তিরতির বাতাস বইছিলো ছাদ জুড়ে। বাদামী মখমলের মতো নরম অন্ধকারে। বেতের চেয়ারে বসে আছি চুপচাপ। দেখছি আলো-আঁধারের ওপারে দূরের পাহাড়টাকে। একবিন্দু আলো দেখা গেলো পাহাড়ের গায়ে, নিবেও গেলো আলোটা, আবার জ্বলে উঠেছে। আশা-নিরাশার দোলার মতো জ্বলছে-নিভছে।

ছাদের ঠিক মধ্যিখানে গার্ডেন চেয়ারে শুভেন্দু আর আকাশ। বাড়ি ফিরে আকাশ স্কচের বোতল খুলেছে। শুভেন্দু তেমন একটা খায়-টায় না, একেবারে অকেশনাল ড্রিংকার, আকাশকে সঙ্গ দিতে সেও আজ পান করছে অল্পস্বল্প। এই মাত্র এসেছিলো পুনম, রেখে গেছে এক প্লেট গরম পকোড়া, ওই পকেড়োতেই শুভেন্দুর বেশি আগ্রহ।

গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে আকাশ হেঁকে উঠলো– কেয়া রোহিনী, তুমি এতো খামোশ কেন?

উত্তর দিলাম না। কথা বলতে ভালো লাগছে না। আকাশের স্বভাবসিদ্ধ জড়তাহীন ভঙ্গিটা দেখে রাগ হচ্ছে একটু একটু। কেন যে শুধু আকাশের ওপরই রাগ হচ্ছে?

আকাশ ফের হাঁক পাড়ল– থোড়া পকোড়া তো লো ভাই। পুনমের পকোড়ার টেস্টই আলাদা। মুখে দিলেই গুমসুম ভাব চলে যাবে।

শুভেন্দু পুটুস করে মন্তব্য জুড়ল– সে আর বলতে। যা ঝাল।

–আরে ভাই, ঝালেই তো মজা।

ব্যস, ঠাট্টা-ইয়ার্কির ফোয়ারা চালু হয়ে গেল। আকাশ ঝালের স্বপক্ষে বলছে, শুভেন্দু মিষ্টির। ছেঁদো জোক শুনিয়ে নিজেই হা হা হাসছে আকাশ। শুভেন্দুও দিব্যি গলা মেলাচ্ছে রঙিন মেজাজে।

বিরক্ত লাগছিল শুনতে। এক সময়ে আর চুপ থাকতে না পেরে বলেই উঠলাম–

–কী গো, ঘড়ির দিকে দেখেছ?

শুভেন্দু চমকে তাকাল– কেন, কী হল?

–ক'টা বাজে বলো তো?

–সাড়ে আটটা।

–রিয়া এখনও ফেরেনি, সে খেয়াল আছে?

শুভেন্দু হেসে ফেলল– তুমি তাই নিয়ে ভাবছ নাকি বসে বসে? আরে বাবা, অদ্যই তো শেষ রজনী, দু'জনে প্রাণের আনন্দে একটু বেরিয়ে নিক না।

পিত্তি জ্বলে গেল। প্রায় খেঁকিয়ে উঠলাম– লাস্ট রাত বলে যা খুশি তাই করতে হবে? আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না।

আমার উষ্মার কারণটা বুঝি অনুমান করেছে আকাশ। গ্লাস হাতে উঠে এল সামনে। আধো অন্ধকার টের পেলাম মুখে হাসির রেখা– আরে, হুয়া কেয়া ইয়ার? ইৎনা ইমপেশেন্ট কিউ?

অসহ্য। শুভেন্দু যে সামনেই বসে খেয়াল রইল না আমার। চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম– আমার যে পেশেন্স নেই সে তো তুমি জানই।

–এ তো রাগের কথা হল।

–রাগ নয়, টেনশান।

–কিসের টেনশান?

–কত কিছু হয়ে যেতে পারে জানো?

–কুছ নেহি হোগা। আকাশ আবার হাসছে জোরে জোরে– মেরা আমন বহুৎ হুঁশিয়ার লেড়কা আছে। দ্যাখো হয়তো কোনও কফি পারলারে বসে আড্ডা মারছে দু'জনে।

রক্ত চড়ে গেল মাথায়। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে চেঁচিয়ে উঠলাম– ওদের দোস্তি দেখে তোমার মজা লাগতে পারে, আমার একটুও লাগছে না। আমার মেয়েটা নয় বোকা, তোমার ছেলের একটা সেন্স নেই? এত রাত পর্যন্ত আমার ইনোসেন্ট মেয়েটাকে নিয়ে...

–আহ, রোহিনী! শুভেন্দু বেশ জোরেই ধমকে উঠেছে হঠাৎ– হচ্ছেটা কী? মাথা ঠাণ্ডা করে বোসো তো।

দাঁতে দাঁত চেপে সামলে নিলাম নিজেকে। আকাশও গুম। আলো-আঁধারে পরিষ্কার বোঝা যায় না, তবে মনে হল এতক্ষণ পর পাহাড়ে মেঘের ছায়া পড়েছে।

গোটা সন্ধ্যের ছন্দটাই যেন কেটে গেছে আচমকা। আকাশ চেয়ারে ফিরে অনেকখানি স্কচ ঢেলে ফেলল গলায়। শুভেন্দু একের পর এক সিগারেট খেয়ে চলেছে। গোমড়া মুখে।

পুনম আবার একটা পকোড়ার প্লেট নিয়ে হাজির। পরিবেশ থমথমে দেখে বেশ অবাক হয়েছে। জিজ্ঞেস করল– ইৎনা সাইলেন্স কিঁউ ভাই?

আকাশ যেন বদলে গেছে হঠাৎ। সদা হাস্যমুখ দিলখোলা মানুষটা অস্বাভাবিক রূঢ় গলায় বলে উঠল– তুমহারা লাডলা লেড়কা কো আনে দো আজ...।

–কিঁউ? কেয়া হুয়া?

–এলোগ ইৎনা পেরেশান হ্যায়, অউর আমন আভি তক্... ইৎনা তো সমঝনা চাহিয়ে, আফটার অল দে আর আউটসাইডারস।

কথাটা ঠং করে কানে ফুটল আমার। পুনমের মুখ পলকে ম্লান। স্বামীর স্বর শুনে বুঝে গেছে কোথায় কেটেছে সুরটা। ধীরপায়ে ছাদের আলসেতে গিয়ে দাঁড়াল। ঝুঁকে দেখছে রাস্তাটা।

খারাপ লাগছিল আমার। বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেললাম কি? আর একটু সংযত থাকা উচিত ছিল বোধহয়।

কিন্তু তীর যে একবার বেরিয়ে গেছে ধনুক ছেড়ে, আর তো ফেরানো উপায় নেই।

তখনই মোটরসাইকেলের গুমগুম আওয়াজটা বেজে উঠল।

ফিরেছে রিয়া আর আমন।

বসে আছি কাঠ হয়ে। দেখছি আকাশকে।

ঝটরকরে উঠে দাঁড়াল আকাশ। পুনম সভয়ে তাকাচ্ছে শুভেন্দুর দিকে। শুভেন্দুও যেন সন্ত্রস্ত। কী না কী ঘটে যায় এক্ষুণি!

আমন আর রিয়া লাফাতে লাফাতে ওপরে উঠে আসছে। আমন বোধহয় কোনও মজার কথা, খিলখিল হাসছে রিয়া। ছাদে এসেই থমকে দাঁড়াল দু'জনে। দেখছে আমাদের।

আকাশ গর্জে উঠল– ইৎনা দের তক কাঁহা থে তুম? ডোন্ট ইউ হ্যাভ এনি সেন্স?

রিয়া তাড়াতাড়ি বলে উঠেছে– সরি আংকল। প্লিজ আমনকে বোকো না। ওর কোনও দোষ নেই। দেরি আমার জন্যই হয়েছে, আমিই ওকে জোর করে...

মুঠো পাকাচ্ছে আকাশ। কী করবে যেন ভেবে পাচ্ছে না এই মুহূর্তে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে এবার হাল ধরেছে শুভেন্দু। অনুযোগের সুরে বলল–

–তোরা এত কেন দেরি করলি বল তো? আমরা সবাই কখন থেকে ভাবছি!

বা রে, কী করব, মুঘল গার্ডেনে গিয়েছিলাম যে।

–দিনের বেলা যেতে পারতে। বেলাবেলি ফিরে আসা উচিত ছিল।

–ধ্যাৎ, সন্ধ্যে না হলে মুঘল গার্ডেনে আলো জ্বলে নাকি? আর আলোয় না দেখলে ফোয়ারাগুলোর বিউটিই বোঝা যায় না।

–তা বলে এত রাত করবি?

–কী এমন রাত হয়েছে? ন'টাও তো বাজেনি। রিয়া হাসছে অবলীলায়– অমন সুন্দর জায়গা থেকে ঝপ করে চলে আসা যায় নাকি?

আশ্চর্য, রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ। স্বাভাবিক। আমনের চোখে-মুখেও কণামাত্র গ্লানি নেই। নেই কোনও অপরাধবোধ।

এই ছেলেমেয়ে দুটোকে আমি সন্দেহ করছিলাম? ছিঃ।

[সাত]

স্যুটকেসে চাবি লাগাতে লাগাতে শুভেন্দু বলল– নাহ, মিস্টার কাপুর বোধ হয় আর আসবেন না।

রা কাড়লাম না। কীই বা বলব? আকাশ আবার আসবে, আশা করাটাই তো অন্যায়। কাল রাতে নিজে গাড়ি চালিয়ে হোটেল অবধি পৌঁছে দিয়ে গেছিল, এই না ঢের।

সারা রাত কাল ঘুমোতে পারিনি। অজস্র প্রশ্ন পাক খাচ্ছিল মাথায়। খুঁজছিলাম নিজের বিশ্রী আচরণের উৎসটা। রাগ কাল কার ওপর ছিল? আকাশের ওপর? আমন রিয়ার ওপর? নাকি নিজেরই ওপর? বহু বছর আগে যে মেয়েটা আকাশের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল তার ওপরই কি চোখ রাঙাই নি আমি? শুধু কালই নয়, এ

ক'দিনে অসংখ্যবার! আমনই তো আমার সেই ছুঁড়ে ফেলে দেয়া আকাশ!

শুভেন্দু ঘড়ি দেখছে এবার। বলল– এইট ফিফটিন। এর পর বেরোলে কিন্তু প্রবলেম হবে। মানালি পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যাবে। মোর দ্যান থ্রি হানড্রেড কিলোমিটার পথ, কম সে কম বারো ঘন্টা তো লাগবেই।

ছোট্ট শ্বাস ফেলে বললাম,– হুম।

–তো কী করব? যাব স্ট্যান্ডে? গাড়ি দেখব?

–করো যা ভাল বোঝ।

রিয়া লাগোয়া ব্যালকনিতে ছিল। অনেকক্ষণ আগেই তৈরি হয়ে গেছে। তার পরনে আজ হালকা নীল জিনস, কালো টি-শার্ট। হাতে সানগ্লাস। ঘরে এসে মাথা নেড়ে বলল– তোমরা এত ছটফট করছ কেন বলো তো? আংকল যখন অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে, গাড়ি আসবেই। আংকলও। আমি শিওর। যথেষ্ট সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি আছে আংকলের। বলতে বলতে টেরিয়ে টেরিয়ে দেখছে আমাকে– তবে বাপি, আংকল নিজে যদি না আসে, আমরা কিন্তু যাওয়ার পথে ওদের বাড়ি ঘুরে যাব। নইলে খুব অভদ্রতা হয়ে যাবে।

–তা তো বটেই। শুভেন্দুর চোখও ঘুরেছে আমার পানে,– তোর মা কেন যে কাল ওরকম একটা ক্যাডাভ্যারাস কাণ্ড করে বসল! মাঝে মাঝে তোর মা'র মাথায় কী যে ভূত চাপে!

ভূতই বটে। মরে যাওয়া সম্পর্কের ভূত। সম্পর্কের মৃত্যুটা তো স্বাভাবিক ছিল না। আমার হাতেই মরেছে। অপঘাতে। তাই হয়তো...

তবে রিয়া যাই বলুক, আকাশ আজ আর আসবে না। আকাশকে আমি রিয়ার চেয়ে ঢের ঢের ভালভাবে চিনি।

দরজায় টকটক শব্দ। বুকটা ধক করে উঠল।

নাহ, বেয়ারা। বকশিশের আশায় এসেছে।

পার্স খুলে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিল শুভেন্দু। সেলাম ঠুকে চলে যাচ্ছে লোকটা, তখনই চেনা গলায় গমগমে আওয়াজ– কেয়া ভাই, তুমলোগ সব রেডি তো?

রিয়ার মুখ নিমেষে উজ্জ্বল। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছে আকাশকে– ও আংকল, তুমি দেরি করলে কেন? আমি কখন থেকে তোমার জন্য ওয়েট করছি!

আকাশের ঠোঁটে সেই পরিচিত হাসি। কৌতুক। যেন কাল কিছুই ঘটেনি। যেন কালকের সন্ধ্যেটাকেও ভাসিয়ে দিয়েছে সময়ের স্রোতে। বাসী ফুলের মতো।

পিঠে হাত রেখেছে রিয়ার। হাসিটাকে চওড়া করেছে, থোড়া গড়বড় হো গিয়া থা। যে গাড়িটা তোমাদের জন্য ফিট করেছিলাম, উসকা ড্রাইভার দারু পি কে কৌন গাটার-মে যা-কে পড়ে আছে। ফির একটা অন্য গাড়ির বন্দোবস্ত করতে হল।

শুভেন্দু গদগদ করে বলল,– সো কাইন্ড অফ ইউ।

–নো ফরম্যালিটি প্রোফেসার সাব। আগেই তো বলেছি, এ আমার ফরজ। হাতে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট ঝুলিয়ে এনেছে আকাশ, প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল রিয়াকে,

–ইয়ে রাখ দো বেটি।

–কী আছে এতে?

–থোড়া-সা কেক-বিস্কিট। আমার বেকারির। গাড়িতে যেতে যেতে খাবে। টাইম পাস।

রিয়া আহ্লাদে গলে গেল,– কিন্তু আমন এল না কেন আংকল?

–এসেছে তো। তুমি চলে যাবে, আর তোমাকে আমন সি অফ করতে আসবে না, এ হতে পারে?

–কোথায়?

–নিচে। দোকানে কী যেন কিনছে তোমার জন্য।

–রিয়েলি?

সঙ্গে সঙ্গে রিয়া ছুটেছে নিচে। হরিণ পায়ে।

আমার দিকে তাকাচ্ছিল না আকাশ। একটি কথাও বলছিল না আমার সঙ্গে। শুভেন্দুর আপত্তি অগ্রাহ্য করে হাতে তুলে নিয়েছে মালপত্র। নামাচ্ছে। ড্রাইভারকে দিয়ে তোলাল গাড়ির মাথায়। সামনে দাঁড়িয়ে ভাল করে বাঁধাচ্ছে প্লাস্টিকের চাদরটা।

আমন আর রিয়া দাঁড়িয়ে তফাতে। চলছে ই-মেল আই-ডি বিনিময়ের পালা। শুভেন্দু গেছে হোটেলের বিল মেটাতে। পায়ে পায়ে পাহাড়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কত ক্ষুদ্র, কী নিচু যে নিজেকে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে! আপনা আপনি মাথা হেঁট হয়ে গেল।

চাপা গলায় বললাম– সরি আকাশ। সরি ফর এভরিথিং।

আকাশ হাসছে মৃদু মৃদু– ছোড়ো ইয়ার। যো বিতা, সো বিতা।

–আমার ওপর রাগ করোনি তো?

–তোমার ওপর রাগ কি করতে পারি রহিনী? কখনও করেছি?

গলা আরও নামিয়ে বললাম,– আবার দেখা হবে।

–কব?

–শিগগিরই। কুলু থেকে ফেরার পথে আসব এখানে। তোমার কাছেই উঠব। তোমার বাড়িতে।

–সচ?

–সচ। আসব। আসব।

আচমকা আকাশের মুখ থেকে হাসি মুছে গেল। স্থির চোখে দেখছে আমাকে। ধীরে ধীরে সরিয়েও নিল দৃষ্টি।

এবারও কি আমার ছল না ধরে ফেলল আকাশ? পাহাড় কি বুঝে গেল উড়ে যাওয়া মেঘ আর ফেরে না কখনও?

আকাশ সরে যাচ্ছে আমার সামনে থেকে। ডাকতে গিয়েও আমি আর ডাকতে পারলাম না আকাশকে। নিঃশব্দে গাড়িতে উঠে বসলাম।

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com

suman_ahm@yahoo.com